নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে চাই সকলের সম্মিলিত পদক্ষেপ

নাসির উদ্দিন

পত্রপত্রিকায় প্রায়ই নারী ও শিশু পাচারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু পাচারের মতো জঘন্য কাজটি যে কতভাবে সংঘটিত হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা যায়, বাংলাদেশে এটি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা ও জঘন্য অনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু মানুষ পাচারের কাজে লিপ্ত হয়। মধ্যযুগে মানুষকে যেভাবে কৃতদাসের মতো ব্যবহার করা হতো বর্তমানে পাচারের মাধ্যমে ঠিক তেমনি ব্যবহার করা হচ্ছে। পাচারকৃত শিশুদের পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। পাচারের কারণে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের সুখশান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষাও শেষ হয়ে যায়।

পাচারের বিভিন্ন সংজ্ঞা থাকলেও কার্যকর সংজ্ঞা হলো-জাতিসংঘের নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ ও পাচারকারীর শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রণীত প্রটোকলে পাচার বলতে বলা হয়েছে-ভয়ভীতি, বলপ্রয়োগ বা শোষণের অন্যান্য পন্থা যেমন, অপহরণ, অসহায় পরিস্থিতি, নিপীড়নের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তির ওপর অপর একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে নিয়োগ, পরিবহণ, স্থানান্তর, আশ্রয় অথবা প্রাপ্তি (UN Protocol to Prevent, Surpressand Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children)।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশের মতো বাংলাদেশও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে। তারপরও এ দেশের শিশুরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্বের সুযোগে একটি চক্র নারী ও শিশু পাচারের মতো জঘন্য কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। এসব পাচারকারী চক্র নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। পাচারকারীরা পাচারের সময় নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন- অপহরণ, ভালোবাসার ফাঁদ, সাজানো বিয়ে, ভালো চাকরির প্রলোভন, পুনর্বাসনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, প্রতিপালন করার প্রলোভন, আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন, ভালো খেলনার প্রলোভন ইত্যাদি। আমাদের দেশের লোকজনও বিভিন্ন সময় পাচারে সহায়তা করে থাকে, যেমন-পরিবার, ঘাট মালিক, সীমান্তরক্ষী, পরিবহণ মালিক বা শ্রমিক, অসচেতন সমাজ, সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি ইত্যাদি। আমরা যদি পাচারের বিভিন্ন ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যায, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরিব পরিবারের বা শহরের বস্তির শিশু, বিভিন্ন পরিবারে গৃহকর্মে বা কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত ও ভাসমান শিশু, এতিম বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু, ঘর পালানো বা সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত শিশুরা সামাজিক বন্ধনের অভাবে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে।

বাংলাদেশের যত শিশু মিসিং বা ট্রাফিকিংয়ের ঘটনা ঘটে তার মাত্র ২৭ শতাংশ দৈনিক পত্রিকায় ও ১২ শতাংশ টিভি নিউজে দেখা যায়। ভারতের কলকাতা, হায়দ্রাবাদ ও মুম্বাইভিত্তিক একটি চক্র দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে একটি শক্তিশালী পাচারের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। যারা নারী ও শিশু এবং কিডনি পাচারে সক্রিয়। গত ১০ বছরে শুধু ভারতেই প্রায় ২ লাখ বাংলাদেশি নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই বয়স ১২ থেকে ৩০ এর মধ্যে।

নারী ও শিশু পাচারের হুমকির কারণে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের সন্তানেরা ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভালো বেতনের কাজ দিয়ে তাদের প্রলোভন দেখিয়ে পরিবারের সম্মতি নেওয়া হয়। পরে বয়স বাড়িয়ে তাদের পাচার করে দেয় এ চক্রের সদস্যরা। পাচার নিয়ে পৃথিবীতে বিশাল বাণিজ্য রয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য যৌনদাসত্ব , জোরপূর্বক শ্রম, শোষণমূলক শ্রম ও অঙ্গ পাচারের মতো কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ওয়ার্ক ফ্রি ফাউন্ডেশনের ২০২০ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাচার হওয়া ভিক্টিমদের মধ্যে ৭১ শতাংশ নারী ও মেয়ে শিশু এবং ২৯ শতাংশ পুরুষ ও ছেলে শিশু। অনেকে নিজ দেশে আবার অনেকে বিদেশে পাচার হচ্ছে। আর এদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে যে কোনো যৌনপল্লিতে। সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে এদের বিক্রি করা হয় পতিতালয়ের প্রধানের কাছে। একবার এখানে প্রবেশ করলে মুক্তি পাওয়া মুশকিল। অনেকে মুক্তি পেলেও সমাজ তাদের আর স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় না। পরে তাদের ফিরে যেতে হয় আগের ঠিকানাতে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে পাচার হওয়া মানুষদের মাঝে ৩৪ শতাংশ নিজ দেশে এবং ৩৭ শতাংশ আন্তঃসীমান্তে পাচার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) রিপোর্ট মতে পাচারকারীরা বছরে ২৫১ বিলিয়ন ডলার আয় করে যার ১৭২ বিলিয়ন আসে যৌন পেশায় বাধ্য করার মাধ্যমে। মোটকথা নারী পাচার আসলে একটি ব্যবসা।

টিআইপি রিপোর্ট ২০২০-এ , মামলা দায়ের, তদন্ত ও পাচারের মামলার বিচারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সরকার ৪০৩ টি মামলা তদন্ত করেছে, ৩১২ জন সন্দেহভাজন (যৌন পাচারের জন্য ২৫৬ এবং জোরপূর্বক শ্রমের জন্য ৫৬) মামলা করেছে এবং ২০১৯ সালে নয়টি পাচার সম্পর্কিত মামলায় ২৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তদন্তে এই হ্রাস কিন্তু আগের তুলনায় দোষী সাব্যস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয় ২০১৮ সালে বিচার বিভাগ ৩৯মামলার বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এতে ৩০ টি মামলায় ৬৮ টি পাচারকারীকে খালাস দিয়েছেন , ৯টি মামলায় ২৫ জন পাচারকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং ১৭ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছে যে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৪০৪ টি পাচারের মামলা তদন্ত বা বিচারের বিচারাধীন রয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর প্রতিবেদনে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট ১৪ জন নারী ও ০৭ জন শিশু পাচারকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই সময়ে তারা ০৩ জন পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এর বিপরীতে সংস্থাটি ১০টি মামলা রজু করেছে, যা পাচারের সংখ্যার অনুপাতে খুবই কম।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও পাচারকারীদের বিচারের মুখোমুখি করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া সম্ভব হলে পাচার দমন করা সহজ হবে। বাংলাদেশের দন্ডবিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০সহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর সার্বিক বাস্তবায়নে কঠোর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা কিংবা সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদের পাচার বিরোধী কার্যক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত অপরিহার্য। কোনো শিশুকে পাচারকারীর হাত থেকে উদ্ধার করার পর তার পুনর্বাসনের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপুর্ণ। শিশুটিকে তার সমাজ বা তার পরিবার যেন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক বিকাশ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

পাচার প্রতিরোধ করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন- সীমান্ত এলাকায় বিজিবি ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে শিশু পাচার প্রতিরোধ সেল গঠন করা, যেসব দেশে শিশু পাচার হয় সেসব দেশের সঙ্গে শিশুদের ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা করা, আদালতে পাচারকারীদের জামিন-অযোগ্য আইন করা, পাঠ্যপুস্তকে পাচারের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা, পাচারকারীর বিচারকার্য দ্রুত শেষ করা, পাচারের ভয়াবহতা সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে বেশি করে প্রচার করা, প্রতিটি থানায় ও বর্ডার চেকপোস্টে পাচারকারীদের ছবি প্রদর্শন করা, শিশু পাচারের সম্ভাব্য কৌশলগুলো জনগণ ও শিশুদের শিখিয়ে রাখা, শিশু পাচার ও নির্যাতন বিষয়ে বেশি করে কর্মশালা ও সেমিনার করা, পাচার প্রতিরোধের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, থানা ও জেলা পর্যায়ে শিশু পাচার ও নির্যাতন বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা, শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের মধ্যে শিশু পাচার ও নির্যাতন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের আদানপ্রদান নিশ্চিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়সাধন করা, উদ্ধারকৃত শিশুর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটি গঠন করা এবং একাজে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নেতৃত্বের ভূমিকা প্রদান করা।

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের শিশুরাই অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। সমাজ-সভ্যতা ও বিধ্বংসী মানবতাবিরোধী এ জঘন্য শিশু পাচার রোধে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও তার সদস্য সংস্থাসমূহ নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। যা পাচার রোধে সচেতনতায় গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই পাচার রোধে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি ও সামষ্টিকভাবে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই শিশু পাচার প্রতিরোধ, শিশু সুরক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা তথা শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা সহজ হবে।

#

পিআইডি ফিচার

তারিখঃ ০৭.০৯.২১